মেঘনাদ পুরস্কার
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ দ্বাদশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী 'বিজ্ঞান দরবার' সংস্থাকে বিজ্ঞান মনস্কতা ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে সামগ্রিক অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ সংস্থা হিসেবে পুরস্কৃত করেন। —বিজ্ঞান দরবার

বিজ্ঞান অন্বেষক

৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

বর্ষ -২ দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল /২০০৫ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

পাখিদের কথা

"উড়তো শকুন চক্রাকারে
দূর আকাশের গায়
আজ আকাশের শামিয়ানায়
তাকেই খোঁজা দায়"

বাড়ির নারকেল গাছে যে পাখি বসলেই বাড়ির মা-পিসিমা বলে উঠতেন 'আগে তাড়া হতচ্ছাড়া পাখিটাকে নইলে বাড়িতে ও অমঙ্গল ডেকে আনবে।' আজ ঘটনাচক্রে আমাদেরই কুসংস্কার ও উদাসীনতার কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ স্থানে উড়তে সক্ষম এই পাখিরা তিলে তিলে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। প্রায় ১১½ কিমি উচ্চতায় চক্রাকারে উড়তে সক্ষম এই পাখিটির নাম শকুন।

শকুন : বাংলায় এরা শকুন বা শগুন নামে এবং ইংরাজিতে Vulture নামে পরিচিত। বড়সড় পোলট্রি

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

জন্ডিস

জন্ডিসের লক্ষণ: জন্ডিসে চোখের সাদা অংশ গায়ের চামড়া, নখ, জিভ ও মূত্র হলুদ হয়।

জন্ডিসের কারণ : আমাদের যকৃত থেকে নিঃসৃত পিত্তর, ১৫-৩০ শতাংশ বিলিরুবিন ($C_{38}H_{36}M_4O_6$) নামক হলুদাভ রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই পিত্ত রস ক্ষুদ্রান্তে চর্বি জাতীয় খাদ্যের শোষণে সাহায্য করে। রক্তে এই বিলিরুবিন এর স্বাভাবিক পরিমাণ প্রতি ১০০ ঘন সেমিতে ০.১-১

এরপর ৬ পাতায়

সুনামি
উৎপত্তি ও পরিণাম

জাপানি শব্দ সুনামি (Tsunami) 'সু' এবং 'নামি' এই দুটি শব্দের সংযোগে তৈরী। 'সু' অর্থ 'Harbour' বা 'পোতাশ্রয়' এবং 'নামি' অর্থ Wave বা তরঙ্গ। জাপানে প্রায়ই সুনামির আনাগোনা ঘটায় তারা এর সঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু সুনামি নিজে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং ভূমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক ঘটনা ফলে সংঘটিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। প্রকৃতপক্ষে এর উৎপত্তির জন্য কি কারণ নিহিত আছে, সেটাই দেখা যাক।

মহীসঞ্চরণ ও প্লেট ভূগঠন মতবাদের আলোকে ব্যাখ্যা : ১৯১২ সালে

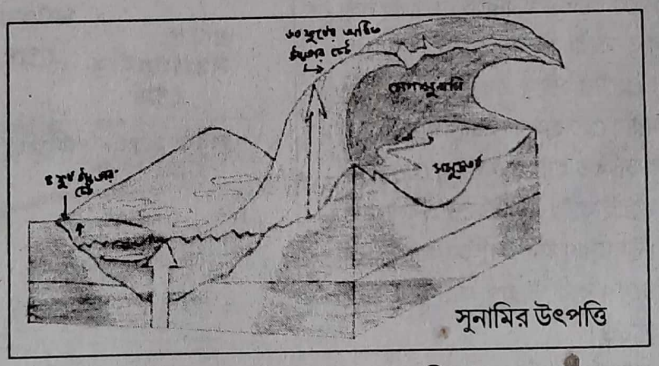

সুনামির উৎপত্তি

জার্মান আবহতত্ত্ববিদ আলফ্রেড ওয়েগনার তার মহীসঞ্চরন মতবাদে বলেন, মহাদেশ ও মহাসাগরগুলি প্রথম থেকেই বর্তমান অবস্থায় ছিল না। মহাদেশগুলি একত্রে প্যানজিয়া ও মহাসাগরগুলি প্যানথালাসা নামে পরিচিত ছিল। ক্রমে জোয়ারি শক্তি ও বৈষম্যমূলক অভিকর্ষজ শক্তি মূলত এই দু'রকম বলের প্রভাবে প্যানজিয়া মূল দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে যার উত্তরাংশটি আঙ্গারাল্যান্ড ও দক্ষিণাংশটি গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে পরিচিত ছিল। ক্রমে কোটি কোটি বছর ধরে সঞ্চরণের ফলে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলি বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে। পৃথিবীর উপরের স্তর বা ভূ-ত্বক দুটি ভাগে বিভক্ত যার উপরের অংশটি সিয়াল (Sial) যা সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে ও নীচের স্তরটি সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম দিয়ে তৈরী সিমা (Sima)। হালকা সিয়াল স্তরটি অপেক্ষাকৃত হালকা গ্রানাইটজাতীয় শিলা দিয়ে তৈরী এবং মহাদেশীয় অংশ গঠন করেছে। ভারী সিমাস্তর ব্যাসল্টজাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং মহাসাগরীয় অংশ গঠন করেছে। ওয়েগনার বলেন, এই হালকা মহাদেশীয় সিয়াল স্তরটি

এর পর ২ পাতায়

সূর্যের গায়েও কলঙ্ক আছে

চাঁদের গায়ে কলঙ্ক আছে। পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালে তার গায়ের কালো দাগ দেখা যায় সহজেই। ঐগুলোই চাঁদের কলঙ্ক। তবে চাঁদ একা কলঙ্কময় নয়। কলঙ্ক সূর্যের গায়েও আছে। এদের বলে সৌরকলঙ্ক বা সানস্পট। মেঘমুক্ত আকাশে দিনের বেলায় সূর্যের চোখধাধাঁনো আলোর জন্য সানস্পট দেখা অসম্ভব। কিন্তু উদীয়মান ও অস্তমান সূর্যের দিকে তাকালে কখনও কখনও সানস্পট দেখা যায়। সূর্যের কলঙ্কের কথা প্রথম বলেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তাঁর নিজের তৈরী দূরবীন দিয়েই তিনি প্রথম সানস্পট দেখতে পান। তাঁর চোখ ক্ষতিগ্রস্তও হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী সানস্পট নিয়ে ব্যাপক আকারে গবেষণা চালান। তাঁদের উদোগ ও চেষ্টা নিষ্ঠাপূর্ণ হলেও সৌরকলঙ্কের রহোস্যোদ্ধার সম্পূর্ণ হয়নি এখনও।

আমাদের পৃথিবীর যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চল, ক্রান্তীয় অঞ্চল, মেরু অঞ্চল রয়েছে তেমনি সৌর চাকতিরও ঠিক মাঝবরাবরও রয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চল। আবার সূর্যের কেন্দ্রস্থল থেকে সৌরপৃষ্ঠ পর্যন্ত রয়েছে কয়েকটি স্তর। এক একটি স্তরকে বলে মণ্ডল। আলোক মণ্ডল হল এরকমই একটা স্তর। এই আলোকমণ্ডলের আলোই পৃথিবীতে আসে সানস্পট থাকে সূর্যের নিরক্ষীয় অঞ্চলের দুপাশে ০° থেকে ৩০° অক্ষাংশের মধ্যে। তারপর সানস্পট সরতে

এর পর ৬ পাতায়

সুনামি

১ পাতার পর

ভারী মহাসাগরীয় সিমাস্তরের ওপর ভাসমান ও বিনাবাধায় সঞ্চরন করছে।

পরবর্তীকালে পিচো, উইলসন, মরগ্যান প্রমুখ প্লেট ভূ-ঘটন মতবাদের অবতারণা করেন। এই মতবাদে কোটি কোটি বছর পূর্বে একত্রিত থাকা মহাদেশগুলির নাম দেওয়া হয় 'ক্রেটন' এবং বলা হয়, ভূ-ত্বক বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের সমষ্টিবিশেষ যারা চ্যুতিরেখা দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। মহাদেশের তলায় এই অংশগুলোর গভীরতা ১৫০ কিমি এবং মহাসাগরের তলায় প্রায় ৭০ কিমি এবং এগুলি ভূ-ত্বকের নীচে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার (গুরুমণ্ডল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এক একটা প্লেটে শুধুমাত্র মহাদেশ বা মহাসাগর বা অংশত মহাদেশ ও মহাসাগর নিয়ে তৈরী। ভূ-পৃষ্ঠে এরকম ৭টি বড়, ৮টি মাঝারি ও ২০টিরও বেশী ক্ষুদ্র প্লেট আছে। প্লেটগুলো কিন্তু স্থির নয়, বছরে কয়েক মিলি মিটার থেকে কয়েক সেন্টিমিটার গতিতে সঞ্চরণশীল। এখন প্রশ্ন হলো প্লেটগুলো গতিশীল কেন? অ্যাসথেনোস্ফিয়ারে সৃষ্ট পরিচলন স্রোতই প্লেটগুলোকে গতিশীল রাখে বলে ভূ-তাত্ত্বিকদের অভিমত। নিম্ন অ্যাসথেনোস্ফিয়ারে অত্যন্ত চাপ ও তাপে সান্দ্র অবস্থায় থাকা পদার্থসমূহ উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরের দিকে এবং পরের অপেক্ষাকৃত শীতল পদার্থ নীচের দিকে নেমে আসলে চক্রাকারে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রভাবেই প্লেটের সঞ্চরণ ঘটে। কখনও প্লেটগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কখনও পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, আবার কখনও পাশাপাশি একে অপরকে অতিক্রম করছে। আগেই বলা হয়েছে মহাসাগরীয় প্লেট অপেক্ষাকৃত ভারী শিলায় গঠিত। কাজেই, সঞ্চরণকালে যদি একটি মহাদেশীয় প্লেটের সাথে একটি মহাসাগরীয় প্লেটের সংঘর্ষ হয়, তবে ভারী মহাসাগরীয় প্লেট হালকা মহাদেশীয় প্লেটের নীচে তির্যকভাবে একটি ঢাল বরাবর চালিত হয়। এই ঘটনা যেকোনো দুটি হালকা ও ভারী প্লেটের সংঘর্ষের ফলেই ঘটে। এই ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকা প্লেট ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করা যায়, যার প্রভাব দেখা যায় এল নিনো সৃষ্টির ক্ষেত্রেও।

সাম্প্রতিক সুনামির উৎপত্তি ও প্রভাব : সাম্প্রতিক ভূমিকম্প যার ফলস্বরূপ এই সুনামি বিপর্যয় তাও উপরোক্ত ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। চলমান মহাদেশীয় প্লেট মায়ানমার প্লেট মহাসাগরীয় প্লেট ভারত মহাসাগরীয় প্লেটের সংঘর্ষে অপেক্ষাকৃত ভারী ভারত মহাসাগরীয় প্লেটটি পিছলে মায়ানমার প্লেটের নীচে চলে যায় প্রায় ৪০ ফুট এবং একবার নয়, পরপর তিনবার। দুটি প্লেটের মধ্যে পিছলে যাবার প্রথম ঘটনাটি ঘটে সুমাত্রার একেবারে উত্তরপ্রান্তের কিছুটা পশ্চিমে। এবং পরের দুবার ঘটে আগের স্থানটির কিছুটা উত্তরে। এই ঘটনারই অনিবার্য ফল হিসাবে প্রবল ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় যার কেন্দ্রটি ছিল সুমাত্রার কাছে ভারত মহাসাগরের প্রায় ৪০ কিমি গভীরে। রিখটার স্কেলে এই ভূ-কম্পের মাত্রা ছিল ৮.৯। সুমাত্রার কাছে ভূ-কম্পনের ঘটনাটি ঘটে সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ এবং ভারতে অনুভূত হয় এর ৩০ থেকে ৩৫ মিনিটের মধ্যে।

এই প্রবল ভূ-কম্পনই উলম্ব বা খাড়াভাবে সমুদ্রের জলকে ঠেলে তোলে এবং মুহূর্তে ফুলে ফেঁপে ওঠা জলতরঙ্গ অতি দ্রুত ঘণ্টায় ৫০০-৬০০ মাইল বেগে মাঝসমুদ্র থেকে ধেয়ে চলে উপকূলভাগের দিকে। কিন্তু মজার কথা হলো সমুদ্রের মাঝখানে সুনামির গতি যতই বেশী হোক, তরঙ্গের আকার বা দৈর্ঘ্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এক-একটি ঢেউয়ের উচ্চতা কয়েক ফুট মাত্র। কিন্তু সেই তরঙ্গই যখন উপকূলের দিকে আসে, তখন তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এবং মূল ভূ-কম্পের প্রাবল্যের অনুপাতে এক-একটি ঢেউ ২০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে ওঠে। উপকূলের দিকে সমুদ্রের গভীরতা যত কমে, ততই সুনামির গতিবেগ কমে এবং মহীসোপানে ধাক্কা খেয়ে rolling process-এ তরঙ্গগুলি বেশী উন্মত্ত হয়ে সাপের ফনার মতো ধেয়ে আসে। তবে কেবলমাত্র উলম্ব অর্থাৎ উপরে নীচে কম্পনের ফলেই সুনামি সৃষ্টি হয়। এরূপ কম্পনের ফলে সমদ্রের জল অপসারিত হওয়ার পরে পরেই অভিকর্ষের টানে

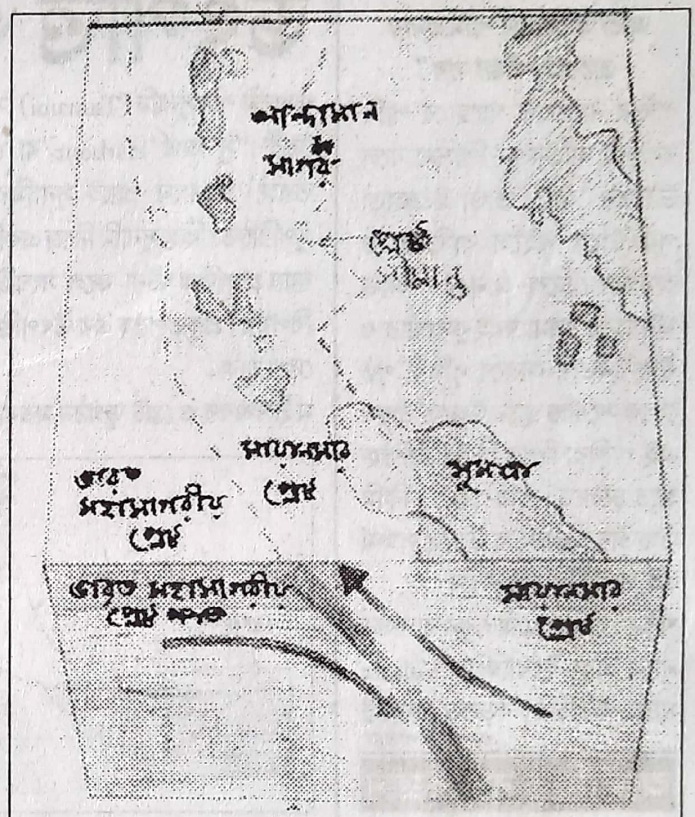

ভারত মহাসাগরীয় ও মায়ানমার প্লেটের সংঘর্ষ

নীচে নেমে এসে সাম্যাবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করলেই তৈরী হয় সুনামি।

সুনামি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলবর্তী সোমালিয়া দেশের সামাজিক আর্থিক ইত্যাদি দিকে যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সেকথা এখানে নতুন করে বলার অবকাশ নেই। বরং উল্লেখ করা যায়, এইসকল দেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর ভৌগলিক পরিবর্তনেও সুনামি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। উপগ্রহ থেকে তোলা চিত্রে দেখা গেছে আন্দামান-নিকোবর ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলির

এরপর ৭ এর পাতায়

English Grammar Coaching Institute for Class IX - XII and Degree
Letter Marks Guarantee (Condition Apply) Pass Marks Guarantee (No Condition)
Contact : T. PAUL
Mob : 9831422719
Nabanagar, Halisahar, North 24 Parganas

পাখিদের কথা

১ পাতার পর

মুরগির মাপের পশ্চিমবঙ্গীয় এই পাখিরা প্রধানত: তিন প্রকার। প্রত্যেকের ঠোঁট ঈগলের মত বাঁকা। প্রথমটিকে বাংলায় শকুন নামেই ডাকা হয়। ইংরাজিতে Bengal Vultur বা White backed Vulture নামে পরিচিত। বিজ্ঞানসম্মত নাম *Gyps bengalensis*। এদের ঠোঁট সাদাটে, দেহ ধূসর-বাদামী পালকে ঢাকা, পিঠ সাদা ও গলায় সাদা ফারের কলার আছে। পালক বিহীন গলাটি বেশ লম্বা এবং মাথাটি ন্যাড়া মানে সব মিলিয়ে কদাকার এক চেহারা যদিও এরকম চেহারা এদের খাদ্যাভাসের কারণে। উড়ন্ত অবস্থায় ডানার তলদেশে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাদা চওড়া দাগ লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়টিকে বাংলায় রাজ শকুন, ইংরাজীতে King Vulture বলে। বিজ্ঞানসম্মত নাম *Sarcogyps calvus*। এদের দেহ গাঢ় বাদামী ও কালচে পালকে ঢাকা, পালকহীন লাল মাথা ও গলায় লালচে রঙের চুপসানো থলি আছে যা এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তৃতীয়টির বাংলা নাম সাদা শকুন বা গিধ্‌নী শকুন। ইংরাজীতে এরা Egyptian Vulture বা Scavenge Vulture নামে পরিচিত। এরা আকারে অন্যান্য শকুনদের চেয়ে ছোটো। বিজ্ঞানসম্মত নাম *Neophron percnopteurus*। দেহ ময়লা সাদা পালকে ঢাকা গলা মুরগির মতই এবং সাদা পালকে ঢাকা মাথায় ঝাঁকড়া সাদা লোমের বাহার, ডানার প্রান্ত বরাবার কালো রঙের পালক সজ্জা আছে। কপাল চোয়াল ও ঠোঁট হলুদ রঙা। শকুন চেনানো মোটামুটি শেষ। যাইহোক এরা স্ত্রী-পুরুষ একই রকমের। ফ্যালকনিফর্মেস বর্গের এই তিনজাতের শকুনেরা চক্রাকারে উঁচু আকাশের গায়ে উড়তে থাকে ডানা মেলে; আর প্রখর দৃষ্টি রাখে অনেক নীচু জমিতে, মৃতদেহের সন্ধানে। শবাহারী প্রাণীদের চলাফেরার উপর এরা কড়া নজর রেখেই মূলত খাদ্য সন্ধানে এরা সফল হয় অর্থাৎ কাক, শিয়াল বা কুকুরেরা কোথাও জটলা করছে দেখলে এরা বুঝে নেয় যে কোনো মৃতদেহ ঐখানে রয়েছে। মৃতদেহের শক্তপোক্ত ভাগীদার না থাকলে দলে দলে প্রতিপক্ষকে ভাগিয়ে লম্বা গলা বাড়িয়ে মাংস ছিঁড়ে খেতে শুরু করে। গ্রামাঞ্চলের ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া গরু মোষের মৃতদেহ সাফাই করতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় নেয় এরা। পৃথিবীতে টিকে থাকতে গভীর অরণ্যাঞ্চলের শকুনেরা বাঘ সিংহের থাবার নাগালে ও মাথা বাড়িয়ে ওদের খাবারে ভাগ বসায়; এরকম দুঃসাহস অন্য কোনও পাখির নেই। খাবার বেশী খেয়ে ফেললে এরা ঐ মাঠেই বা অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু জায়গায় বসে ঘন ঘন বিষ্ঠাত্যাগের মাধ্যমে দেহের ওজনটা সহনশীল করে নেয়। বর্ষায় ভিজে যাওয়া ডানা শুকোতে বা শীতে রোদ পোহাতে ওরা ডানা মেলে মাঠে বা ডানপালাহীন ডালে বসে থাকে অনেকক্ষণ। এরা উড়বার সময় বা মাঠে নামবার সময় দৌড়ে যায় খানিকটা; অনেকটা প্লেনের মত। এরা চিঁ চিঁ স্বরে কর্কশ হাসির মত শব্দে ডাকাডাকি করে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের শকুনেরা নির্জন নারকেল গাছে, বট, অশ্বত্থ, পাঁকুড় প্রভৃতি গাছের মগডালে শুকনো ডালপালা দিয়ে ঢাউস মাচার মতো বাসা বাঁধে। White backed শকুন ১টি সাদা (লাল-বাদামী ছিটযুক্ত) ডিম পাড়ে রাজশকুন ২টি সাদা ডিম পাড়ে। তৃতীয় অর্থাৎ সাদা শকুন আবার কাঠকুটো, জন্তুজানোয়ারের চামড়ার টুকরো, চুল ও ছেড়া কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি নানান জঞ্জাল দিয়ে পুরোনো আমলের নির্জন ভাঙা বাড়ির ফাঁক ফোঁকরে বা পাহাড়ী অঞ্চলে পাথরের খাঁজের মধ্যে

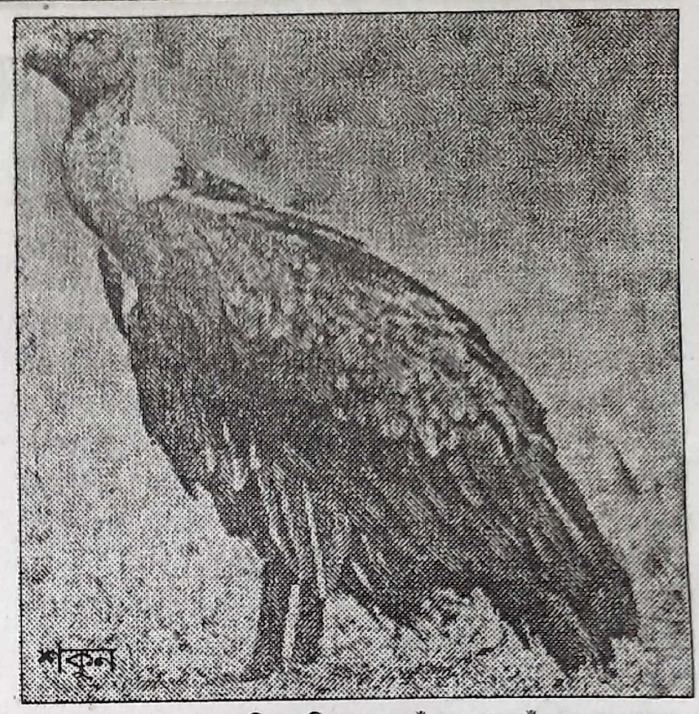

শকুন

কখনো বা বড় গাছের গুড়ির দুটি ডালের খাঁজে বাসা বাঁধে। হালকা লাল কালো ছোপ যুক্ত সাদা রঙের ডিম পাড়ে।

আজকের নীলাকাশে শকুনের দেখা নেই, বদলে চিল বাজদের ভীড়। এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে বলা যায় (ক) দিনের বেশীর ভাগ সময় এদের বাসা অরক্ষিত থাকে ফলে বাচ্চা বা ডিম অন্য পাখি যেমন কাক চিল বাজেদের শিকার হয়, (খ) আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ডিমের ভ্রূণ অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং শকুন মা নির্দিষ্ট সময়ে ডিম না ফোটায় তা দেওয়া বন্ধ করে দেয়, (গ) গ্রাম-শহরে মৃত পশুদেহ জীবাণু দুর্গন্ধের ভয়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় ফলে এরা খাদ্যের অভাবে দিনকে দিন সংখ্যায় কমছে, (ঘ) সীমিত খাদ্যের ভাগাভাগি নিয়ে আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রামে এরা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। (ঙ) বর্তমানে এদের ডিমগুলি ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে এবং ভ্রূণ দশায় যথেষ্ট ক্যালসিয়াম অভাবে বংশবিস্তার বাঁধা পাচ্ছে। (চ) অশ্বত্থ, পাকুড়, শিমুল প্রভৃতি স্বাভাবিক বড় পর্ণমোচী বৃক্ষের সংখ্যা শিল্প-শহরের চাপে কমছে সাথে কমছে শকুনের স্বাভাবিক বাসস্থান। প্রাকৃতিক ঝাড়ুদার পাখি এই শকুনদের বাঁচাতে গেলে দরকার স্বাভাবিক খাবার ফিরিয়ে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে দরকার কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করার অনুকুল পরিবেশ।

—পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, ২৬৮৪-৫৫৫৪

খবর : ১৯-২০ ফেব্রু: পূর্ব মেদিনীপুরে জলধা নবজাগরণ তরুণ সংঘ আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ও NISC, নৈহাটি কর্মীরা সর্পপ্রদর্শনী, খাদ্যে ভেজাল ও বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকা সহ অংশ গ্রহণ করে।

✆ ২৫৮৫-৬০৯৪
বিজলী
পেপার এন্ড ষ্টেশনার্স
কে.জি.আর.পথ, (লক্ষ্মী সিনেমার বিপরীতে) কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

✆ 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
Life Insurance Of India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

আইনস্টাইনের ছেলেবেলা

নিউইয়র্কের হাডসন নদীর তীরে রিভারসাইড চার্চ। ১৯৩০ সালে চার্চে এলেন এক প্রৌঢ় দম্পতি। একসময় ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে এক মূর্তির কাছে নিয়ে এসে বললেন, 'আলবারতল, ওই দেখ তোমার মূর্তি'। ভদ্রলোক মূর্তিটি দেখলেন। তাঁর অবিন্যস্ত চুল আরো অবিন্যস্ত হলো। চোখের দৃষ্টি হলো আরো স্বপ্নালু। তাঁদের চোখের সামনে যে ছ'শো মূর্তি তাদের মধ্যে পাঁচশ নিরানব্বইটি মৃত মনীষীর। অবশিষ্ট মূর্তিটি জীবন্ত এক মনীষীর যিনি সশরীরে তখন তাঁর নিজের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে। এই ভদ্রলোকটি বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

অ্যালবার্টের জন্ম ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জার্মানীর উলম শহরে এক ইহুদি পরিবারে। বাবা হেরম্যান আইনস্টাইন একজন ব্যবসায়ী। গণিতশাস্ত্রে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। মা পলিন সঙ্গীত খুব ভালোবাসতেন। ভালো গাইতেও পারতেন। পিয়ানোও খুব ভালো বাজাতেন। এসবের প্রভাব পড়েছিল শিশু অ্যালবার্টের উপর। হেরম্যানের ভাই জ্যাকব ছিলেন একজন ভালো ইঞ্জিনীয়ার। অ্যালবার্টের কাকা জ্যাকব অ্যালবার্টদের সাথেই থাকতেন।

১৯৮০ সালে অ্যালবার্টরা চলে আসেন মিউনিখে। অ্যালবার্টের বাবা ও কাকা নিউ নিখে ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতির একটি ছোট্ট কারখানা খুললেন। মিউনিখের খুব কাছে সেন্ডলিং-এ নিজেদের বসবাসের বাড়ী তৈরী করলেন। ১৮৮১ সালে অ্যালবার্টের বোন মারিয়ার জন্ম হল। অ্যাবার্ট বোনকে মাজা বলে ডাকতেন। মিউনিখে গাছপালায় ঘেরা অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা ছিল। এসব জায়গায় হেরম্যান তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসতেন পিকনিক করতে। এসব পিকনিকে হেসিনগেন থেকে সপরিবারে এসে যোগ দিতেন হেরম্যানের খুড়তুতো ভাই রুডলফ আইনস্টাইন। সঙ্গে থাকতেন মেয়ে এলসা। এলসা ছিলেন আইনস্টাইনের মাসতুতো বোন বা পিতার দিক থেকে খুড়তুতো বোন। অ্যালবার্ট ও এলসা একসাথে খেলাধূলা করে বহু দিন কাটিয়েছেন।

ছোটবেলায় অ্যালবার্ট ছিলেন বেশ গম্ভীর এবং কিছুটা চাপা প্রকৃতির। ছিলেন শান্ত ও নম্র। চুপচাপ আপনমনে থাকতেই পছন্দ করতেন। বেশি সঙ্গীসাথী পছন্দ করতেন না। অ্যালবার্ট কথাও বলতে শুরু করেছিলেন অনেক দেরিতে। সেইজন্য নিজের কথা ঠিকমতো সবসময় বোঝাতেও পারতেন না। সৈন্যদের মার্চ করে যাওয়া দেখে তিনি ভীষণ ভয় পেতেন। যুদ্ধের বাজনা এবং সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ একদম সহ্য করতে পারতেন না। অথচ এই বাজনা প্রায় সব ছেলেরাই ভালোবাসে। অ্যালবার্ট ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁর এই অনুভূতি তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনে এক শান্তিবাদী হিসাবে গড়ে তুলেছিল। একসময় ইহুদিদের উপর হিটলার এবং তাঁর নাৎসী বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে অ্যালবার্টের শান্তিবাদী মন প্রতিবাদীর ভূমিকা নিয়েছিল। ফলে তাঁকে কম সমস্যায় পড়তে হয়নি। জুটেছে অনেক লাঞ্ছনা।

অ্যালবার্টের বাবা ও কাকা ভালো গাইতে পারতেন। আবৃত্তিও করতেন খুব সুন্দর। আগেই বলেছি অ্যালবার্টের মা পলিন ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞা। খুব ভালো পিয়ানোও বাজাতেন তিনি। অ্যালবার্টদের বাড়িতে মাঝে মাঝে সঙ্গীতের সান্ধ্য আসর বসত। সেখানে পলিন পিয়ানোতে বিটোভেন, মোজার্ট ইত্যাদি বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতকারদের রচনা বাজাতেন। হেরম্যান কখনো গ্যেটে, শীলার ইত্যাদি বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিকদের লেখা পাঠ করে শোনাতেন। জেকব কখনো আবৃত্তি করতেন। আবার সবাই মিলে কখনো জার্মানীর প্রাচীন পল্লীগীতি গাইতেন। ছোটবেলায় অ্যালবার্টও সান্ধ্য আসরে যোগ দিতেন। পিতামাতার সঙ্গীতানুরাগ ছোট্ট অ্যালবার্টের মনে গভীর প্রবাব বিস্তার করে। আস্তে আস্তে তিনি সনাতন সঙ্গীত ও সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। গ্যেটে ও শীলারের লেখা তিনি পড়তে পছন্দ করতেন। ফাইস্টের কাব্য ছিল তাঁর খুব প্রিয়। তিনি প্রায়ই 'ফাউস্ট' থেকে আবৃত্তি করতেন। ছয় বছর বয়স থেকে তিনি শিক্ষকের কাছে বেহালা শিখতে শুরু করেন। চোদ্দ বছর বয়স থেকে পারিবারিক সান্ধ্য আসরে যোগ দেন। ভবিষৎ জীবনে তিনি বহু জায়গায় বেহালা বাজিয়েছেন। তিনি উঁচু স্তরের বেহালা-বাদক ছিলেন না ঠিকই কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা ছিল যথেষ্ট। তিনি পিয়ানো বাজাতেও খুব ভালোবাসতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'বাইরে কোথাও গেলে, আমার খুব মনে হতো কখন বাড়ি গিয়ে পিয়ানোর ঘাটগুলির উপর দিয়ে আঙুল চালাবো। অ্যালবার্টের এই সঙ্গীত ও সুরপ্রীতির সঙ্গে মিশে যায় তাঁর বিজ্ঞান-ভাবনা। ভৌত জগৎ যে গাণিতিক নিয়ম ও ছন্দে বাঁধা তা উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হতে সাহায্য করে তাঁর এই সঙ্গীত প্রীতি।

অ্যালবার্টের বয়স যখন প্রায় পাঁচ বছর তখন তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমনিতেই তো চুপচাপ থাকতেন, আরো চুপচাপ হয়ে গেলেন। তা' দেখে কোন বাবা মা-র ভালো লাগে! বাবা হেরম্যান তাঁর জন্য একটি খেলনা এনে দিলেন। নৌ কম্পাস। খেলনা পেলে ছোটদের ভালোই লাগে। অ্যালবার্টেরও লেগেছিল। কম্পাসের কাটার সব সময় একটা নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে থাকা এবং কাটাটাকে একটু ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে আবার আগের নির্দিষ্ট দিকে চলে আসার বিষয়টি ছোট্ট অ্যালবার্টকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তাঁর মনে প্রবল বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়। তিনি সারাক্ষণ সম্পাসটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। এমনকি বিছানায় শুতে যাবার সময় কম্পাসটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এই কম্পাস তাঁর মনে এক গভীর ও স্থায়ী অনুভূতি জাগিয়ে ছিল। মানব-চেতনা-নিরপেক্ষ জগতের সত্তা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল।

—গোবিন্দ দাস

ফর্ম : IV

রেজিস্টেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস ১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে :

১। **প্রকাশ স্থান** : ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা পিন-৭৪৩১৪৫

২। **প্রকাশকাল** : দ্বিমাসিক

৩। **প্রকাশক** : জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড
কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
পিন-৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৪। **সম্পাদক** : শিবপ্রসাদ সরদার
কেডিয়াবাগান, জোনপুর, কাঁচরাপাড়া
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৩৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৫। **মুদ্রক** : জয়দেব দে
ক্রীন আর্ট, ২০, নেতাজি সুভাষ পথ
কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৬। **স্বত্বাধিকারীর নাম** : জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড
কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
পিন-৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

আমি জয়দেব দে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

জয়দেব দে

৮ মার্চ ২০০৫ প্রকাশকের স্বাক্ষর

খাদ্যে ভেজাল : কিভাবে জানব ?

গত সংখ্যায় খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম। জেনেছিলাম এই ভেজাল খাদ্য আমাদের কি কি শারীরিক অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই ভেজালের হাত থেকে আমরা কিভাবে বাঁচবো। ভেজাল সংক্রান্ত আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগের ব্যাপারে আমরা প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি। কিছু ভেজাল আমরা আমাদের বাড়িতে হাতে কলমে সামান্য উপকরণের সাহায্যে পরীক্ষা করতে পারি। এই সংখ্যায় সেই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা হবে। মানুষ যদি এর ফলে খাদ্য বিষয়ে সচেতন হন তাহলেই আমাদের লেখা সার্থক হবে।

এবার আসুন এই সব ভেজাল ধরবার কিছু পদ্ধতির দিকে আলোকপাত করা যাক —

১। কিশোরী রঙ বা মেটানিল ইয়েলো	সন্দেহজনক রঙীন খাবার একটি পাত্রে নিয়ে এর মধ্যে বর্ণহীন কয়েক ফোটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (অথবা মিউরিয়েটিক অ্যাসিড মেশান হয়। মিশ্রণ গোলাপী (লালচে বেগুনী) হয়ে যায় তাহলে খাদ্যদ্রব্যে অবশ্যই কিশোরী রং আছে।
২। কঙ্গোরেড	খাদ্যে কঙ্গোরেড পরীক্ষা করতে খাবারটি জলে গুলে নিয়ে ওর মধ্যে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করুন। রঙ লাল থেকে নীল হয়ে গেলে বুঝবেন খাদ্যে কঙ্গোরেড মেশান আছে।
৩। রোডামিন-বি	একটি টেস্ট টিউবে সামান্য সন্দেহজনক রঙীন খাবার নিয়ে ওর মধ্যে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড যোগ করে জোরে ঝাঁকাতে থাকুন। যদি লাল রঙ অদৃশ্য হয় তাহলে বুঝতে হবে রেডামিন-বি মেশানো ছিল। অবশ্য লাল রঙ অদৃশ্য হবার পর মিশ্রণে এক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলে পুনরায় লাল রঙ ফিরে আসবে।
৪। ম্যালাকাইট গ্রীন	সামান্য পরিমাণে তুলো তরল প্যারাফিনে ভিজিয়ে নিয়ে সবুজ সব্জী, মটরশুঁটি প্রভৃতির গায়ে ঘষতে থাকুন। তুলো সবুজ হলে বুঝবেন ভেজাল হিসাবে ম্যালাকাইট গ্রীন আছে।
৫। জল, ময়দা, আটা, অ্যারারুট, ভাতের মাড়, প্রভৃতি স্টার্চ জাতীয় পদার্থ	দুধে ভেজাল হিসাবে কেবলমাত্র জল থাকলে ল্যাকটোমিটারের পাঠ ২৬° এর কম হবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ল্যাকটোমিটারের পাঠ ঠিক রাখার জন্য দুধে জলের সঙ্গে সাদা ভাতের মাড় বা অ্যারারুট মেশান হয়। ভেজাল ধরতে হলে সামান্য দুধে আয়োডিন দ্রবণ বা টিনচার আয়োডিন দ্রবণ মেশান। দুধ নীল বর্ণ ধারণ করলে বুঝবেন ভেজাল রয়েছে।
৬। বনস্পতি বা ডালডা	একটি টেস্ট টিউবে এক চামচ ঘি বা মাখন, এক চামচ ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও সামান্য চিনি নিয়ে মিশ্রণটিকে ঝাঁকান ও সামান্য গরম করুন। তারপর স্থির অবস্থায় রেখে দিন। এ অবস্থায় যদি নীচের স্তর গাঢ় খয়েরী রঙ ধারণ করে তবে বুঝতে হবে ঘি বা মাখনে বনস্পতি (ডালডা) মেশান আছে।
৭। ইউরিয়া	মুড়ি ভাজার সময় ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়েছে কিনা জানতে হলে কিছু পরিমাণ মুড়ি প্রথমে অল্প জলে দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। পরে মুড়ি ছেঁকে বাদ দিয়ে জল সংগ্রহ করুন। এই জলে ২ চামচ অড়হর ডালের গুঁড়া মিশিয়ে সামান্য গরম করে পাঁচ মিনিট রেখে দিন। এরপর এই দ্রবণে ফিনলপথ্যালিন মেশালে যদি গোলাপী হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে মুড়িতে ইউরিয়া আছে।
৮। শিয়ালকাঁটা বীজের তেল	পরীক্ষানলে তেল নিয়ে প্রায় দ্বিগুণ বর্ণহীন নাইট্রিক অ্যাসিড সহ ঝাঁকাতে হবে। অ্যাসিড স্তর লাল হয়ে গেলে বুঝতে হবে ঐ তেলে শিয়ালকাঁটা বীজের তেল ছিল।
৯। রং করা পূর্বে ব্যবহৃত চা পাতা বা রং করা ডালের ভূষি	সন্দেহজনক চা পাতা ব্লটিং কাগজে ছড়িয়ে উপর থেকে জল ছিটিয়ে দিলে কাগজে রঙ ধরা পড়বে।
১০। চামড়ার গুড়া	ভেজাল চায়ে সামান্য গরম জল দিয়ে একটি তরল মিশ্রণ তৈরী করে লঘু HCl এবং $KMnO_4$ ঢালতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না মিশ্রণ বর্ণহীন হয়। এরপর এতে কষ্টিক সোডা (NaOH) যোগ করে জারীয় করার পর তুঁতের লঘু দ্রবণ ($CuSO_4, 5H_2O$) যোগ করলে যদি দ্রবণ লাল বা বেগুনী বর্ণ হয় তবে বুঝতে হবে চায়ে চামড়ার গুঁড়া মেশান রয়েছে।

সুজয় বর্মন

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

মিলিগ্রাম রক্তে এর থেকে বেশী পরিমাণ বিলিরুবিন থাকলে প্রস্রাব, চোখের সাদা অংশ, শরীর হলুদ হতে থাকে। সাধারণ ভাবে ভাইরাস জনিত যকৃত প্রদাহ ফলে রক্তে বিলিরুবিন বাড়ে। এই ভাইরাস মারার কোন ওষুধ নেই। শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার ফলে এই রোগ ৭-১০ দিনে সেরে যায়। এছাড়া পিত্তনালীতে পাথর, টিউমার, ক্যান্সার ইত্যাদি হলেও রক্তে বিলিরুবিন এর পরিমাণ বাড়ে।

চিকিৎসা : জন্ডিসে ৭-১০ দিন বিশ্রাম নিতে হয়। চর্বি জাতীয় খাদ্য, তেল, ঘি, বিভিন্ন মশলা কম খেতে হবে সহজ পাচ্য ভিটানিযুক্ত খাদ্য ও চিনির জল বেশী করে খেতে হবে। এবং অবশ্যই ডাক্তারী পরামর্শ নিতে হবে। পিত্তনালীতে পাথর, টিউমার, ক্যানসার লে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

জন্ডিস সারানোর অপকৌশল : (১) *ন্যাবার মালা* : বামুন হাটির শিকড় দিয়ে একটি মালা তৈরী করে। এই মালা গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। দেখা যায় মালাটি আপনাআপনি বড় হয়ে শরীর দিয়ে নেমে যায়। আসলে মালা গড়ে কৌশলে। বামুনহাটির শিকড় ফাঁপা, এর উপর দিয়ে ফাস গিট দিয়ে মাল তৈরী হয়। ২-৩ দিনে শুকিয়ে ছোট হয়ে যায় আর ঐ গিটও ছোট হতে থাকে ফলে মালা বেড়ে যায়।

হাত ধোওয়া : অনেকের ধারণা জন্ডিসের উৎপন্ন গায়ের হলুদ রঙ বের করতে পারলে জন্ডিস সেরে যাবে। আসলে জল হলুদ হয় কৌশলে। ওঝা-গুনিন ঐ বিশেষ 'জল'কে গঙ্গার জল বলে দাবি করে সেটি হল চুন জল। আর আগে থেকেই তা নিজের হাতে আম গাছের ছালের রস মেখে রাখে। এই আমগাছের রসের সঙ্গে চুনজল মিশলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে জল হলুদ হয়। কোনও মন্ত্র বলে নয়।

তাই জন্ডিস হলে ওঝা-গুনিনের কাছে না গিয়ে দ্রুত রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে হবে।

—পান্নালাল মণি

সূর্যের গায়েও কলঙ্ক আছে

১ পাতার পর

থাকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে। প্রথমে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরা আরও নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে সরে আসে। এরই সঙ্গে কমতে থাকে এদের সংখ্যাও। অবশেষে এই নিরক্ষীয় অঞ্চলেই এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। সানস্পটের এই অবস্থান, সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে একটি চক্রের মধ্যে দিয়ে। সানস্পট উৎপন্ন হওয়া থেকে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত হল একটা চক্র। এই চক্রের সময়কাল ২২ বছর। বিজ্ঞানী হেইনরিখ স্কোয়ের (Heinrich Schwabe) সৌরচক্রের আবিষ্কর্তা। প্রতিটি সানস্পটের দুটো অংশ। কেন্দ্রের অঞ্চলকে বলে আমব্রা (Umbra) ও কেন্দ্রের চারপাশের অঞ্চলকে বলে পেনামব্রা (Penumbra)। যদিও সোনস্পট বৃত্তাকার নয় অসম আকৃতির। এর ব্যাসার্ধ ইউরোপ মহাদেশের মতনও হতে পারে আবার একটা গোটা পৃথিবীর মতনও হতে পারে। গত জানুয়ারিতে যে সানস্পট চিহ্নিত করা হয়েছিল তা সাতটা পৃথিবীর সমান।

চন্দ্রপৃষ্ঠে উল্কা আছড়ে পড়ার জন্য চাঁদের গায়ে গর্ত তৈরী হয়। এইসব গর্ত ও মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখই আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের কলঙ্করূপে দেখতে পাই। কিন্তু সূর্যের কলঙ্ক তৈরীর সম্পূর্ণ কারণ এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। তবে সানস্পটের সঙ্গে চৌম্বকক্ষেত্রের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চৌম্বকক্ষেত্রটা কি সেটা একটু জানা যাক। আমরা সবাই জানি চুম্বক লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট এই তিন ধাতুকে আকর্ষণ করে। এই তিন ধাতুকে বলে চৌম্বক পদার্থ। চুম্বকের দুই প্রান্তকে দুই মেরা বলে। একটা উত্তর মেরু, অপরটি দক্ষিণ মেরু। এখন ধরা যাক কোন একটা চুম্বককে কোন একটা স্থানে রাখা হল। চুম্বকটির চারপাশের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে চৌম্বক পদার্থকে রাখলে চুম্বক তাদেরকে আকর্ষণ করবে। ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে থাকা কোন চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকটা আকর্ষণ করবে না। চুম্বকের চারিদিকে যে নির্দিষ্ট অঞ্চল পর্যন্ত চুম্বকের আকর্ষণ বল কাজ করে সেই অঞ্চলকে চৌম্বকক্ষেত্র বলে। চুম্বক মত শক্তিশালী হবে তার আকর্ষণ বল ও চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তিও যত বেশী হবে। তীব্র শক্তিসম্পন্ন এই চৌম্বকক্ষেত্র ও সানস্পটের সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সানস্পট জোড়ায় জোড়ায় দল বেঁধে তৈরী হয়। প্রতি জোড়ার একটা উত্তর মেরু ও অন্যটা দক্ষিণ মেরুর মত আচরণ করে। ১০.৮ বছর পর উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে ও দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুতে পরিণত হয়। সানস্পট অন্ধকার হয় কারণ এই অঞ্চলের তাপমাত্রা সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলের তাপমাত্রা ৪৫০০° সে:, সেখানে সূর্যের আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০° সে:। এই স্পটগুলোর চারপাশে থাকে হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম গ্যাসের উজ্জ্বল মেঘ। এদের বলে ফ্লোকিউলি (Floculi)।

সূর্যকে সাধারণত: শান্ত নক্ষত্র বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সূর্যে যখন এই সানস্পট তৈরী হয় তখন সূর্য ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সানস্পটের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে এই সক্রিয়তাও বেড়ে যায়। সূর্য সাংঘাতিক অশান্ত হয়ে ওঠে। এর প্রভাবও পড়ে পৃথিবীর ওপর। সৌরঝড় সৌরশিখা তৈরী হয়। সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে আগুনের শিখা সেকেন্ডে ১০০০ কিমি গতিবেগ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। এগুলোই সৌরশিখা। সৌরশিখা ১৬,০০,০০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এর তাপমাত্রা প্রায় ১০ মিলিয়ন ডিগ্রি সে: (১০০০০০০০ সে:)। সৌরশিখার সঙ্গে সূর্য থেকে বেরিয়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে তড়িৎযুক্ত কণা ও প্লাজমা (পদার্থের চতুর্থ অবস্থা)। আলোর গতিবেগ নিয়ে এই কণা ছুটে এসে পড়ে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে (আমাদের পৃথিবী একটা চুম্বক)। এর ফলে পৃথিবীর দুই মেরুতে দেখা যায় মেরুজ্যোতি। রাতেও দুই পৃথিবীর মেরুপ্রান্তে কখনও কখনও সূর্যের আলোর মত আলো দেখা যায় তাই হল মেরুজ্যোতি। বেতার, দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ ছবি পাঠানো হয় তাদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তবে সানস্পট থেকে একটা বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া গেছে। তা হল নিজ অক্ষের চারিদিকে সূর্যও ঘুরছে। সৌরচাক তির এই ঘূর্ণন সূর্যের সব অংশে সমান নয়। সূর্যের যে অঞ্চলে সানস্পটের সংখ্যা বেশী সেই অঞ্চলে ঘূর্ণনের বেগও বেশী। এতসব জানা সত্ত্বেও সূর্য সম্পর্কে আমাদের কাছে এখনো খুব বেশী তথ্য নেই, বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্য দিয়েই এই ধারণা আগামী দিনে আরো বিকশিত হবে।

—কাকলি সরকার
(বিজ্ঞানকর্মী)

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

সুনামি

২ পাতার পর

অনেকাংশই সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হয়েছে, কোথাও বা জেগে উঠেছে নতুন স্থলভাগ। প্লেটগুলির তিনবার পিছলে যাওয়ার যে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়েছে বা প্রায় ২০ কোটি টন ট্রাই-নাইট্রো টলুইন বিস্ফোরণের সমান তাতে উত্তর সুমাত্রা থেকে উত্তর আন্দামান পর্যন্ত ১২০০ কিমি এলাকায় সমুদ্রবক্ষে বিশাল ফাটল ধরেছে এবং ১০ বছর পর জেগে উঠেছে ব্যারন আগ্নেয়গিরি। স্থায়ীভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ বেড়ে গিয়ে দিনের সময় কমেছে ৩ মাইক্রোসেকেন্ড। ধ্বংস হয়েছে আন্দামানের প্রবাল দ্বীপগুলি। শুধু তাই নয়, এর ফলে হিমালয় সংলগ্ন ভারত ও চীনের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে, বৃষ্টিপাত কমে দেখা দেবে খরা আবার তাপমাত্রা বেড়ে হিমবাহ গলে প্লাবিত হতে পারে হিমালয়ের পাদদেশ।

তবে, সুনামি নিয়ে যত বিস্ময়ই থাক, প্রকৃতপক্ষে এটি একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা। V.S.A -র ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল ডেটা সেন্টারের তথ্যানুযায়ী ১৯৯০-৯৯-এর মধ্যে বিশ্বজুড়ে হওয়া ৯৭০টি সুনামির মধ্যে ৮৪২টি ছিল নিরীহ। তবে ভারত মহাসাগরে এধরনের মেগা-সুনামি না ঘটায় আমাদের কাছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকায় এটি নতুন নাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালের ২৭শে আগষ্ট কারাকাটাউ আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠায় প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে ও সুনামির প্রভাবে জাভা ও সুমাত্রার প্রায় ৩৬ হাজার মানুষ মারা যান। জাপানের মতো দেশে যেখানে সুনামি পরিচিত ঘটনা সেখানে ভূ-কম্প তরঙ্গ ব্যাখ্যা করে সুনামির পূর্বাভাস দেবার ব্যবস্থা আছে। ভারতসহ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিতে এধরনের ব্যবস্থা না থাকলেও শীঘ্রই সুনামি ওয়ার্নিং ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা চলছে। আশার কথা, বিজ্ঞানীরা বলেছেন ভূমিকম্পের আগাম সতর্কবাণী দেওয়া সম্ভব না হলেও সুনামির আগাম সতর্কতা দেওয়া সম্ভব। তবে ভাবলে অবাক লাগে না পশু-পাখিরা তাদের শরীরস্থিত রিসেপটরের সাহায্যে টের পেয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যা টের পায়নি বেশীরভাগ উন্নত আবহাওয়া দফতরগুলি। বাতাস সমুদ্র ও পাখিদের গতিবিধি আঁচ করার মতো প্রাকৃতিক শিক্ষাই অক্ষত রেখেছে আন্দামানের জারোয়া, ওঙ্গীদের। যেখানে কংক্রীটের দেওয়াল জলোচ্ছ্বাসে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সেখানে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ও প্রবাল প্রাচীর অটুট থেকে আঘাত শোষকের কাজ করেছে। সেজন্যই সুনামির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পশু-পাখিরা রিসেপটরের সাহায্যে যন্ত্র তৈরীর বা প্রাকৃতিক দাওয়াই হিসাবে ম্যানগ্রোভ ও প্রবাল প্রাচীরের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা নতুন করে ভাবা হচ্ছে। *—শাশ্বতী মিত্র, শিক্ষিকা, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়*

বিজ্ঞানের খবর

৮-৯ ফেব্রু: **শ্রীমা মহিলা সমিতি** (দত্তপুলিয়া) আয়োজিত বরণবেরিয়া কে এস বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সচেতনতা বর্ষে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। 'জল আতঙ্ক' ও 'সুনামি' নাটক মঞ্চস্থ হয়। বিজ্ঞানকর্মী বিবর্তন ভট্টাচার্য, অভিজিৎ বর্ধন, জয়দেব দে, আশীষ মুখার্জি সহ ১২ জনকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

২২-০২-২০০৫ **হরিণঘাটা নগরউখরা উচ্চ বিদ্যালয়ে** বিজ্ঞান সচেতনতা বর্ষে পানীয় জলে আর্সেনিক ও জলাভূমি শীর্ষক এক আলোচনাসভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞানকর্মী শুভঙ্কর ঘোষ, বিবর্তন ভট্টাচার্য, পান্নালাল মণি বক্তব্য রাখেন।

২৬-০২-২০০৫ **বিজ্ঞান দরবারের** পরিচালনায় হালিশহর লোকসংস্কৃতি ভবনে মহাবিশ্বের এক রঙিন আলোক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্লাইড সহযোগে বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ

মেঘনাদ পুরস্কার, ২০০৪

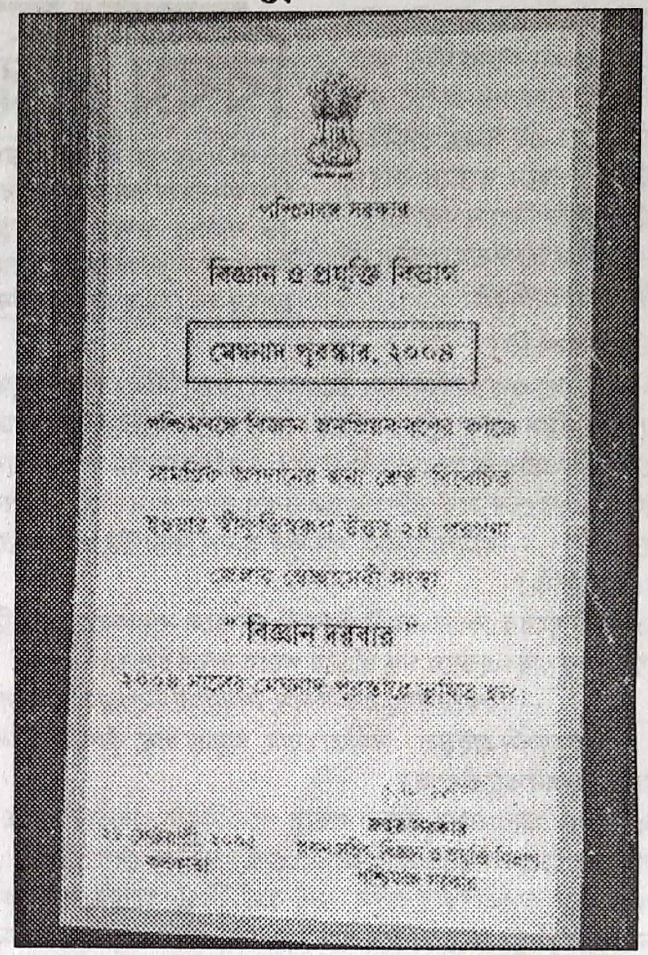

প্রশ্নোত্তর

বিষয় : বিজ্ঞানের মজা

১৮-০২-২০০৫ কাঁচরাপাড়া কাজীনজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৪৪টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞানের মজা বিষয়ে ১০টি প্রশ্নের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সেরা উত্তর ছাপান হল। (সামান্য সংশোধন সহ)

প্র : প্রকৃতি বিজ্ঞান কি ?

উ: আদিম মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালাতে শেখে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করেছে। এমন অনেক ঘটনা আছে যা দেখে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে রয়েছে কারণ, যাকে প্রকৃতি বিজ্ঞান বলা হয়।

—সুপ্রতিম তরফ দার ও সুমন দে, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল

প্র: অভিস্রবণ কি ?

উ: কতগুলো শুকনো কিসমিস নিয়ে জলে ফেলে দিলে দেখব কিছুক্ষণ পরে কিসমিস গুলো ফুলে উঠেছে। কিসমিসের মধ্যে এইরকম জল ঢুকে ফুলে ওঠার কারণ হল অভিস্রবণ। যে প্রক্রিয়ায় কম ঘনত্বের দ্রবণ অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে বেশি ঘনত্বের দ্রবণে প্রবেশ করে তাকে অভিস্রবণ বলে। *—শর্মিলা মল্লিক, পানপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ, হরিণঘাটা।*

প্র: ব্যাপন কি ?

উ: একটি ঘরের কোনে একটি ধূপকাঠি জ্বালালে সারা ঘরে ধূপকাঠির গন্ধে ভরে যায়। এভাবে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার কারণ হল ব্যাপন।

—বিশ্বশ্রী রায়, রজনী দাস, শিমুরালী উপেন্দ্র বিদ্যা ভবন ফর গার্লস হাইস্কুল। সঙ্গীতা ঘোষ, অমৃতা দাস, কাঁপা হাইস্কুল।

প্র: প্রতিফলন কাকে বলে ?

উ: কোনও বস্তুর ওপর আলো পড়ার পরে কিছুটা আলো ফিরে এসে আমাদের চোখে পড়লে তবে আমরা সেই বস্তুটিকে দেখতে পাই। যে বস্তুটি থেকে আলো ফিরে আসে। সেই বস্তুটি কিছুটা আলো শোষণ করে নেয়। আর কিছুটা আলো ফিরে এসে আমাদের চোখে পড়ে। একে আমরা প্রতিফলন বলি।

—সুপ্রতীম তরফদার ও সুমন দে, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল। মৌলিনা দত্ত, অনামিকা ভাওয়াল, হালিশহর অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়।

প্র: বায়ুর চাপ আছে তা কিভাবে প্রমাণ করবে ?

উ: একটা সেদ্ধ ডিম নিয়ে একটি সরু মুখ ওয়ালা কাঁচের বোতলের ওপর রাখলে দেখব তা ভেতরে ঢুকছে না। কারণ, ভেতরে বায়ু ভর্তি। কিন্তু এবার একটু তুলো নিয়ে একটা জ্বলন্ত কাঠি জ্বালিয়ে বোতলের মধ্যে ফেলে দিলে ভেতর থেকে একটু ধোঁয়া বেরবে। ডিম সহজেই কাঁচের বোতলের ভেতরে ঢুকবে। কারণ, কাঠি জ্বালাবার ফলে ভেতরটি বায়ুশূন্য হয়ে যায়। ফলে সহজেই ডিম ভেতরে ঢুকতে পারবে। এটাই বায়ুর নিম্নচাপের প্রমাণ।

—সৌম্যদেব মণ্ডল, অরিজিৎ মজুমদার, বড়জাগুলি গোপাল একাডেমি।

প্র: জোনাকি কেমন করে আলো দেয় ?

উ: দ্যুতিসম্পন্ন পোকা জোনাকি। জোনাকির আলোর বৈজ্ঞানিক কারণ হল বিশেষ ধরনের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এদের তলপেটের যে অংশটি থেকে আলো নির্গত হয়, সেই স্থানটিতে লুসিফেরিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে। অক্সিজেনের সংস্পর্শে এবং লুসিফেরাস (Luciferase) নামে একটি উৎসেচক-এর উপস্থিতিতে লুসিফেরিন জারিত হয়। এই বিক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত শক্তি আলো রূপে নির্গত হয়। এভাবেই জোনাকি আলো দেয়। রাত্রিবেলা এই আলো স্পষ্ট দেখা যায়। *—সমর্পিতা দাস, মালিত মুর্মু, পলাশী আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুল।*

প্র: শিশির চকচক করে কেন ?

উ: শীতের সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখি ঘাসের আগায় ও কচু পাতায় শিশির কণাগুলো চকচক করছে। এক্ষেত্রে সূর্যের আলো এমনভাবে আপতিত হয় যে শিশিরকণা কোনও আলো শোষণ না করেই পুরোটা ফিরিয়ে দেয়। ফলে শিশিরগুলো চকচক করে। একে আমরা পূর্ণ প্রতিফলন বলি।

—মধুমিতা ঘোষ ও প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, বিধানচন্দ্র মেমো: গভ: গার্লস হাইস্কুল।

প্র: তোমার জানা কয়েকটি বিজ্ঞানের মজার উদাহরণ দাও।

উ: বিজ্ঞানের কয়েকটি মজার উদাহরণ : (১) শুকনো কিসমিস জলে ফেলে দিলে কিসমিসগুলি ফুলে উঠবে। (২) সূচিছিদ্র ক্যামেরা (৩) তড়িৎ লেপন (৪) ইলেকট্রিক ফ্যান, বাল্ব, টেলিভিশন, কম্পিউটার, (৫) ধূপকাঠির গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়া।

—বিশ্বশ্রী রায়, রজনী দাস, সৌম্যদেব মণ্ডল, অরিজিৎ মজুমদার। শিশির সরকার, রঞ্জিত বাড়িক, হারিপুকুরিয়া হাইস্কুল।

প্র: বিজ্ঞান শেখার সহজ উপায় কি ?

উ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বহু মজার ও কৌতুহলোদ্দীপক দিক আছে। যেমন, খেলার ছলে বিজ্ঞান সেখা যায়। বিজ্ঞান মানেই ভীতি, বিজ্ঞান মানেই মাথা ঠাণ্ডা থিয়োরি, ফর্মূলা আর দুর্বোধ্য নাম মুখস্থ করা নয়। বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে শেখার ও জীবনের আনন্দ। প্রয়োজন শুধু শেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো। বিজ্ঞানের আমরা অনেক বই পড়ি। আবার বিজ্ঞান শেখানোর জন্য অর্থাৎ কুসংস্কার দূর করার জন্য নানা সংস্থা গড়ে উঠেছে। যেমন, বিজ্ঞান দরবার। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি বিজ্ঞানের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য, বিজ্ঞান শেখার সহজ উপায়।

—অর্পিতা বসু, তানিয়া বর্ধন, রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ, বড়জাগুলি। মধুমিতা ঘোষ ও প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল।

প্র: বিজ্ঞান আমাদের কি কাজে লাগে ?

উ : অ্যালার্ম ঘড়ি, টুথপেস্ট, মুখ ধোওয়ার জল, খবরের কাগজ, গ্যাস, স্টোভ, মাইক্রোওভেন, ওভেন, ট্র্যাক্টর, চাষের বীজ, কীটনাশক, ই সি জি, স্ক্যান, এক্সরে, আলো, পাখা, টিভি, ফ্যান, কম্পিউটার, যোগাযোগ। আমরা আজ যাই পেয়েছি সবই বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। তাই বিজ্ঞানের কাছে আমরা চীরঋণী।

—মধুমিতা ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, বিধানচন্দ্র মেমো: গভ: গার্লস হাইস্কুল।

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব বিজ্ঞান দরবার সংস্থা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। পাঠকের মতামত ও লেখা পাঠানোর আবেদন জানাচ্ছি।
ফোন : সম্পাদক — ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০ (মো), ২৫৮৫-৬০৩২, ২৫৮৫-০৬৩৯, ২৮৭৬০৭২০

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার।
E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.